Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501051 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Swarnakumari Devi's 'Kahake' and Tarashankar Bandyopadhyay's 'Radha': Women's voices in two novels

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা': দুই উপন্যাসে নারীর কণ্ঠস্বর

Putul Ghosh
Former Student
Bengali Department
Bankura University

Received on: 14th May 2026
Accepted on: 27th May 2026

Abstract:

The wave of influence that Western literature exerted under the impact of the nineteenth-century Renaissance significantly affected Bengali literature as well, and soon thereafter a major shift in literary direction took place. In nineteenth-century Bengal, the Bengal Renaissance, the reform movement of the Brahmo Samaj, the spread of women's education, and the influence of Western education profoundly transformed society. Its direct reflection can be observed in literature — especially in the novel. Though comparatively younger in age, the history of the Bengali novel is glorious. It became a medium through which real life, social conflict, morality, and questions of individual freedom were newly articulated.

In 'Kahake' (1898), Swarnakumari Devi presents, with gentle satire and sensitivity, the issues of female self-identity, the morality of love, and social crisis within the urban bhadralok society of the nineteenth century. On the other hand, in 'Radha' (1958), Tarashankar Bandyopadhyay unveils, against the backdrop of rural Bengal in the twentieth century, the realities of male-female relationships, desire, moral conflict, and the patriarchal social order with powerful realism.

These two novels, written by two different novelists from two different centuries, stand upon distinct temporal and social grounds, yet together they construct a complex discourse on women, love, and society. Focusing on the two central heroines, Moni and Mohini, I intend to present a comparative discussion through which the inner emotions, pain, suffering, desires, reluctances, and aspirations for freedom of these women become comprehensible.

The heroines Moni and Mohini embody two different forms of love. Although the time and context of the two novels differ, they are thematically connected. In 'Kahake', the romantic dilemma of the educated urban woman Moni (or Mrinalini) is foregrounded, whereas in Radha, the love, struggle, and social reality surrounding the rural woman Krishnadasi and Gobinda are vividly portrayed. On one side stands the women's

© Santiniketan Sahityapath

consciousness shaped by the Renaissance; on the other, the modern realist representation of rural womanhood. This contrast and similarity together create a new field of discussion regarding the position of women in Bengali literature.

Key Words:

Renaissance, Bengal Renaissance, Western Literature, Rural Society, Women’s Education, Social Conflict, Moral Crisis, Rural Women

মূল প্রবন্ধ

‘‘পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নূতনে আকৃষ্ট হইয়াছে, অথবা নূতনে মুগ্ধ হইয়া সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি? কাহাকে ভালোবাসিতে এ কাহাকে ভালোবাসিয়াছি?’’[১] আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়তো অবাক লাগে যে উনিশ শতকের শতক শেষ হওয়ার আগেই ১৮৯৮ সালে এক নারী ঔপন্যাসিকের কলমে এমন একটা জিজ্ঞাসা দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে ‘কাহাকে’ উপন্যাসটি। উনিশ শতকের শেষ পর্বে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। এই ছিয়াত্তর বছরের জীবন পরিধিতে কত কিছুই না করে গেছেন তিনি। কুড়ি বছর বয়সে লিখেছিলেন প্রথম উপন্যাস। আঠাশ বছর বয়সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত সাহিত্যপত্র ‘ভারতী’ সম্পাদনায়। ত্রিশ বছর বয়সে অবরোধবাসিনী মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা আর সচেতনতার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সখি সমিতি নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এত কাজের ফাঁকেও জীবনভর লিখে গেছেন উপন্যাস ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গান। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেছেন। সময় সম্পর্কে তাঁর ছিল যুক্তিবাদী মনোভাব। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার ও সমাজকে অত্যন্ত নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস ‘দ্বীপনির্মাণ’। (১৮৭৬) স্বর্ণকুমারী দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হলো, ‘মিবাররাজ’ (১৮৮৭), ‘হুগলির ইমামবাড়ী’ (১৮৮৮), ‘বিদ্রোহ’ (১৮৯০), ‘ফুলের মালা’ (১৮৯৫)। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে এবার বেছে নিলেন সামাজিক প্রেক্ষাপট লিখলেন ‘ছিন্নমূল’(১৮৭৯)। আর সময় পরিধিতে লেখা ১৮৯৮ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘কাহাকে’।

অপরদিকে আরেকজন বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত জনপ্রিয় উপন্যাসিক তথা কথাসাহিত্যিক যিনি বাংলা উপন্যাসের বড়ো ঐতিহ্যকে মেনে এবং তাকে ছাপিয়ে নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন তিনি হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যাও কম নয়। ছোটোগল্প, নাটক উপন্যাস সব দিকেই তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। বিষয়ের পরিকল্পনায়, কাহিনি নির্বাচনে, গঠনের নতুনত্বে তিনি চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা বেশ কিছু উপন্যাস হলো ‘চৈতালি ঘূর্ণি’ (১৯৩১), ‘পাষাণ পুরী’ (১৯৩৩), ‘নীলকণ্ঠ’ (১৯৩৪), ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ (১৯৩৫), ‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৪৯), ‘কালিন্দী’ (১৯৪০), ‘গণদেবতা’ (১৯৪২), ‘পঞ্চগ্রাম’ (১৯৪৩), ‘অভিযান’ (১৯৪৭)। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মধ্যভাগের কাহিনি অবলম্বনে রচিত তার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘রাধা’ (১৯৫৮)। ঔপন্যাসিক অনেকগুলি বিষয় একত্রিত করে এই রাধা উপন্যাসটি রচনা করেছেন। যেখানে একাধারে উঠে এসেছে যেমন মুসলমান রাজশক্তির কথা অন্যদিকে আবার তান্ত্রিক ধর্ম বিদ্রোহের কাহিনি, আবার রয়েছে বৈষ্ণব শৈব সম্প্রদায়ের কথা। স্বকীয়া ও পরকীয়ার বিবাদ এই কাহিনির স্নায়ুকেন্দ্রে বর্তমান।

‘‘নিউটন গ্যালিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনো জন্মায় নাই। কবে জন্মাইবে কে জানে?’’ মালতি উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী এই উক্তিটি করেছেন। সত্যিই তো মানুষের মন বড়োই জটিল বিশেষত নারী মনের স্বরূপ বোঝা দায়। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর উপন্যাসের জীবনভর এই নারী মনের স্বরূপ খোঁজার এবং বোঝারই চেষ্টা করে গেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস ‘কাহাকে’ (১৮৯৮)। সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে নায়িকা মণির আত্মকথন উত্তম পুরুষের জবানিতে শুনিয়ে গেছেন লেখিকা, “Men's love is of men’s live a think apart Tis women's hole existence” (Byron)। লেখিকার প্রশ্ন, একজন পুরুষ হয়েও নারীর মনের এমন সত্য স্বরূপটি কীভাবে হুবুহু বুঝতে পেরেছিলেন। ভালোবাসার বর্ণবিভাই এই ‘কাহাকে’

© Santiniketan Sahityapath

উপন্যাসের একমাত্র উপযোগ্য বিষয়। উপন্যাসের নায়িকা মণি বা মৃণালিনীর ছোটোবেলা থেকেই তার সমস্ত ভালোবাসা ছিল তার বাবাকে ঘিরে আর সেটা হওয়ায় স্বাভাবিক কেননা আমরা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা পেয়েছি। ছোট্টো মণি যখন একটু বড়ো হয়ে পাঠশালায় গেল তখন সে ভালোবাসতে শুরু করল সর্দার পোড়ো ছোটুকে। বুঝে উঠতে পারত না ছোটোমণি কাকে যে বেশি ভালোবাসে; তার বাবাকে নাকি ছোটুকে! ছোটু আসার আগে থেকেই সে বাগান থেকে ফুল তুলত এবং সেই ফুলগুলি তুলে তার বাবাকে দিত। এখন একটা সুন্দর ফুল পেলে তার মনে সংশয় আসতে থাকে। এই ফুল সে কাকে দেবে তার প্রাণের থেকেও প্রিয় বাবাকে নাকি তার খেলার সাথী ছোটুকে। আর শুরু হয়ে যায় ভালোবাসার দ্বন্দ্ব। ছোটুর কণ্ঠে শোনা একটি গান — "হায় মিলন হলো, যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেল !" এই একটিমাত্র গান চিরদিনই রয়ে গেল মণির মনের মণিকোঠায়। শুরু হলো মণির আস্তে আস্তে যৌবনের দিকে পদার্পণ। ছোট্ট মণি বড়ো হয়ে উঠল। তারপর অনেক বছর পরে সুশিক্ষিতা ও পূর্ণ যুবতী মণি যখন তার ব্যারিস্টার ভগ্নিপতি ও দিদির গৃহে বেড়াতে গেল তখন আবার নতুন করে এক প্রেমের আস্বাদ পেল। পরবর্তীকালে নবীন ব্যারিস্টার রমানাথের গলায় সেই একই গান "হায়! মিলন হলো, যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেল!" এই গান শুনে মণির মনে প্রেমের পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয়। তার হৃদয়ে গভীর অনুরাগের উদ্রেক হলো ঠিকই কিন্তু মনে মনে ভালোবাসা দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল সে। মণি কাকে ভালোবাসে — এই ব্যারিস্টার রমানাথকে নাকি তার গলায় শোনা সেই গানকে যে গান দীর্ঘদিন ধরে তার মনে কোণে অনবরত বেজে চলেছে! শুরু হলো আবার একটা দ্বন্দ্ব আবার একটা জিজ্ঞাসা 'কাহাকে'? ঘটনাক্রমে রমানাথের ব্যবহারে মণির আশা ভঙ্গ, আঘাত এবং অসুস্থ হয়ে পড়া আর এই অসুখের সময় তার ভগ্নিপতির এক বন্ধু ডাক্তার বিনয় কুমারের আগমন ঘটে। বিনয় ডাক্তারের সেবা-শুশ্রূষা, আন্তরিক সমবেদনা ও ভালোবাসা মিশ্রিত সু-ব্যবহার দেখে মণির মনে তার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে এবং যা রূপ নেয় প্রেমের। রমানাথের মধ্যে স্বার্থপরতার গন্ধ পেয়ে অবশেষে ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ল মণির হৃদয়, "ইহাই কি প্রেম যে তৃষ্ণার তৃপ্তি নাই, যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে আসার সফলতা নাই, তাহাই কি প্রেম?" ডাক্তারকে ভালোবেসে মণির একটা কথা বারবার মনে হয়েছে "যথার্থ ভালবাসা হৃদয়ের একটা শিক্ষা, সেটা শুধু আবেগ নয়, তার উপযুক্ত পাত্র চাই।"[২] মণির বাবার আগমন এবং কলকাতা থেকে তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। এবং সেখানে তার বাল্যসখা ছোটুর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ধীর করা আর ঠিক এরপরেই শুরু হয়ে যায় নায়িকা মনের প্রেমের দোটানা। এক গভীর অবস্থার সংকটের পড়েছে মনে। কিন্তু। তাহার সমস্ত সন্দেহের অবসান হয়েছে ডাক্তার বিনয় কুমার ও ছোটুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। মণি বলেছে, "কি করিয়া বলিব তাহা কি মধুর, পুরুষের নিকট হইতে যে পুরুষকে ভালবাসি, তাহার নিকট হইতে প্রথম শোনা সে আমারই! পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তবে ইহাই তাই, ইহাই তাই।" কিন্তু পাঠকের মনে একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যায় যদি ছোটু এবং বিনয় কুমার একই ব্যক্তি না হতো তাহলে মণি কাকে বেছে নিত ? সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে লেখিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নারী মনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি নারী প্রেম এবং দ্বন্দ্বকে। ভাবতে অবাক লাগে বিশ শতক তখনো শুরু হয়নি অথচ বিবাহে নারীর স্বেচ্ছা নির্বাচনের দাবি নিয়ে দেখা দিল মৃণালিনী। প্রেমে পুরুষের এখন একনিষ্ঠা দাবি করল, নির্বিচার আত্মসমর্পণ নয়, বিচার করে নিতে চাইলো তার ভাবি স্বামীর চরিত্র। মণির মধ্যে মৃদুহাসিনী নারীর ছোঁয়া থাকলেও সে কিন্তু স্পষ্টবাদিনী, তার অধিকার সে ভিক্ষা করে পেতে চায় না। প্রয়োজনে তা অর্জন করবে। তার দাবি সে ছিনিয়ে নেবে। মণির কথা তার চরিত্র সবকিছু মধ্যে আমরা একজন শিক্ষিতা, আদর্শ যুক্তিবাদী, মননশীল, চিন্তনশীল বাস্তববাদী, আত্মসচেতন, আত্মশ্রদ্ধা আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ এক স্বাধীনচেতা নারীর প্রতিচ্ছবি পেয়ে থাকি।

স্বর্ণকুমারীর সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের নিপুণ ছবি ধরা পড়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটি পড়ার সময় পাঠক মনে একটা প্রশ্ন বারংবার উঠে আসে যে সত্য কী একশো বছরের বেশি আগে লেখা হয়েছে এই উপন্যাস, কথাগুলি এতটাই প্রাসঙ্গিক যে একশো বছর পরেও এই উপন্যাসে আধুনিকতার ছাপ থেকে যাবে! একজন নারী ঔপন্যাসিকের কলমে ধরা পড়েছে নারীরই অন্তরের কথা, তাই উপন্যাসটি আরো আকর্ষণীয় এবং হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। তৎকালীন সমাজকে অতিক্রম করে গেছে নারী ও তার প্রেম সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে প্রেম ভালোবাসার রোমান্টিক বাতাবরণ তৈরি করেছেন লেখিকা এবং এক গভীর জিজ্ঞাসা দিয়ে

© Santiniketan Sahityapath

উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন — "পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নতুনে আকৃষ্ট হইয়াছে অথবা অথবা নতুনে এ মুগ্ধ হইয়া সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি? কাহাকে ভালবাসিতে এ কাহাকে ভালোবাসিয়াছি?"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' (১৯৫৮) লেখকের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসটির স্নায়ুকেন্দ্রে রয়েছেন কংসারি সাধক মাধবানন্দ। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ইলামবাজার ও তার আশেপাশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিচয় দিয়ে। বাংলায় তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পরকীয়াবাদীরা বেশ প্রভাবশালী ছিল। এমনকি ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ছিল বিস্তৃত। আবার অনেকেই ছিল ন্যাড়ানেড়ি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত। যাদের নিজস্ব আখড়া বা আশ্রম গড়ে তুলেছিল এমন দুটি নারী চরিত্র কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী এবং তার মেয়ে গোবিন্দমোহিন্দী। আর এদেরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির মূল কাহিনির সমৃদ্ধি বিস্তার ও যথার্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

রাধাহীন 'রাধা' উপন্যাসটিতে বাস্তবিক রাধারূপ প্রকাশ পায় মোহিনীর মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটির শুরুতে পনেরো বছরের কিশোরী মোহিনী অপরিপক্ক মনের ও অপরিপূর্ণ দেহের অধিকারী হলেও নবীন সন্ন্যাসীকে দেখার পর থেকে কিশোরী মোহিনী যেন যৌবনা মোহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে সে তার রূপে মুগ্ধ হয় এবং তাকে ভাবে নবীন যুগের কৃষ্ণপ্রতিম। মাধবানন্দের জন্য তপস্যাই তাপসী হয়ে উঠেছে সে। অন্যদিকে ভীষ্মের মতো মাধবানন্দ ছিল নারীসঙ্গাহীনতায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঘটনা ক্রমে মাধবানন্দের প্রিয় শিষ্য গোপালানন্দের হাত থেকে মোহিনীকে রক্ষা করে মোহিনী তার সমস্ত জীবন মাধবানন্দের কাছে সমর্পণ করে জানিয়েছে — "গোঁসাই, তুমি-তুমি আমার শ্যাম, তুমি আমার গৌরু, তুমি আমার ঠাকুর, তুমি আমার গোসাই।"[৩] মাধবানন্দ বুঝলেন "প্রেম বড়ো সহজে বিকৃত হয় কাম পঙ্কে পরিণত হয়। সারা বৈষ্ণবধর্মের বিকৃত বিষ আকণ্ঠ পান করেও বিষাক্ত আজ সেই বিষপুষ্ট জীবন কামনা যেন লক্ষ লক্ষ বীজের মতো একসঙ্গে ফেটে অঙ্কুর মেলে জেগে উঠেছে। ওর এই জলসিক্ত দেহের রূপক রূপে যেন সর্বনাশের বিজয়দগম হচ্ছে তবু যে শেষ চেষ্টা তিনি করবেন।"[৪] আত্মসমর্পিত মোহিনী মাধবানন্দের পায়ের উপর মুখ গুজে ব্যাকুল হয়ে মাধবানন্দ পা টেনে নিয়ে তাকে ছুড়ে ফেলে দিলে আঘাত পেয়ে মোহিনীর ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। তবুও মোহিনী অসহায় করুণ বৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে তার শ্যামসম মাধবানন্দের দিকে।

উপন্যাসটির পরিণতিতে অবলা সরলা মোহিনীর এক অজানা পথে যাত্রা। অজয়ের বুকে নৌকা যাত্রা সময় তার কাঁদতে কাঁদতে বহুবার একটা কথাই মনে হয়েছিল — "ওগো গোঁসাই, ওগো দেবতা, যদি ওই অক্রেরের মতো কুমিরের হাত থেকে বাঁচালে, এতই দয়া যদি করলে, যদি দাসী হিসেবে আমাকে চেয়েছো তবে মাঝ নদীতে ছেড়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিলে কেনে আমি যে সাঁতার জানিনা দয়াল... দয়াল ওগো নবীন গোসাই।"[৫] এ হেন বিভিন্ন উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে মাধবানন্দের প্রতি মোহিনীর গভীর প্রেম ব্যক্ত হয়েছে। বারবার আর এই প্রেমের বিকাশও ঘটেছে দ্রুত গতিতে। মোহিনী তো কোনো সাধারণ নারী নয় তুলনীয়ায় সে রাধার সমরূপিণীও বটে। ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান তার কাছে রাধার মাথুর বিরহের তুল্য। মাধবানন্দের কঠিন ব্যাধি থেকে ছদ্মবেশী প্যারে বাঁশিওয়ালি রূপে মোহিনীর তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলা। মোহিনী একাধারে রাধা ও একাধারে মীরা, রাধার মতো গভীর প্রগাঢ় প্রেম যেমন তার মধ্যে আছে তেমনি আছে মীরার মতো গভীর তপস্যা। মাধবানন্দ যখন তার মুখ দর্শন করতে চাইলো তখন মোহিনী তার মুখ দেখাতেই চাইলো না। কারণ তার গুরুর যদি তার মুখ দেখে রাগ হয়, "না গোঁসাই। ভগবানের দর্শন তো আমি মানি নাই, আমি চিরদিন চেয়েছি আমার শ্যাম — আমার গুরুর দর্শন। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে গোঁসাই — ষোলো বছর।"[৬] এই প্রেম তো কোনো সাধারণ প্রেম হতে পারে না। এই প্রেম স্বর্গীয় তুল্য। মাধবানন্দকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে কুম্ভের জলে তার পা ধুয়ে দিতে পেরে মোহিনীর সাধনা সফল হয়েছে ধন্য হয়েছে মোহিনী। মোহিনী হৃদয়ে অপার প্রেম দেখে বাকরুদ্ধ হয়েছে মাধবানন্দ — "অকলুষ আনন্দে অসংঙ্কোচে বাহু বিস্তার করে প্রার্থীর মতো নত যেন হয়ে বসলেন, এতক্ষণে কথা বের হলো, তুমি রাধা — আমার রাধা।"[৭] এই একটা কথাতেই মোহিনীর সমস্ত জীবন সার্থক ও প্রেমের জয়গান।

© Santiniketan Sahityapath

দুই উপন্যাসের নায়িকা মণি এবং মোহিনী দুজনে পরস্পর তুলনীয়া এবং অতুলনীয়। তুলনীয়া কেননা উভয়ই কোমল হৃদয়সম্পন্ন সহজ সরল মনের অধিকারিণী। তুলনীয়া কেননা উভয়ই প্রকৃতি প্রেমিক নারী। দুই উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখি নায়িকা মণি ও মোহিনীর উভয়ই প্রণয় আসক্ত রমণী যাদের কিশোর অবস্থা থেকেই ফুলের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা। তুলনীয় কেননা উভয়ই প্রণয় আসক্ত রমণী যাদের কিশোর অবস্থা থেকেই প্রেমের সূত্রপাত, প্রেমের লুকোচুরি, পরিণতিতে নায়কের সঙ্গে মিলন। আবার তারা পরস্পর তুলনীয়া নয় কেননা ভিন্ন জাতির বস্তুতে তুলনা হয় না। 'কাহাকে'র মণি প্রতিবাদী সাহসী স্পষ্টবাদী অপরদিকে রাধার মোহিনী ভীরু, অতখানি সাহস তার মধ্যে নেই। অতুলনীয়া কেননা প্রণয়কে কেন্দ্র করে বা দুজনের হৃদয়ে প্রণয়ের একটা বিস্তৃত জায়গা থাকলেও এই প্রণয়ের দ্বন্দ্বের কারণে মণি চরিত্র বা মণির মনকে আমাদের কোথাও যেন মাঝে মাঝে একটু জটিল লাগে। কিন্তু মোহিনীর মধ্যে না আছে কোনোরূপ প্রণয়দ্বন্দ্ব না আছে কোন জটিলতা। সহজ সরল নিরীহ এক রমণী সে।

অতুলনীয়া কেননা মণি ছোটো থেকে মাতৃহারা পিতাকে কেন্দ্র করে তার সমগ্র ভালোবাসা শৈশব অতিবাহিত হয়েছে অপরদিকে রাধার মোহিনীর তার মা কৃষ্ণদাসীর পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে ওঠে এবং কঠোর শাসনে বেড়ে ওঠে। তুলনীয় নয় কেননা কাহাকের মণি নায়ক বিনয় কুমারের কাছে সেবা-শুশ্রূষা যেখানে পেয়েছে অন্যদিকে রাধার মোহিনী স্বয়ং সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছে নায়ক মাধবানন্দকে। অতুলনীয়া কেননা 'কাহাকে'র মণির আত্মমর্যাদা বোধ আত্মসম্মান বোধ প্রবল। তার আত্মসম্মানে যদি তার প্রেমিক পুরুষ আঘাত করে তাহলে সে কোনো ভাবেই সেটা মেনে নেবে না। অপরদিকে মোহিনীর মধ্যে আমরা আত্মমর্যাদা বোধের এই প্রবণতা দেখতে পায় না, মাধবানন্দ তাকে পাপিষ্ঠা বললে বা তার মাকে অপমান করলে এমনকি তাকে আঘাত করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও, বারংবার তিরস্কার করে ফিরিয়ে দিলেও পুনরায় সে তার চরণ আশ্রয়ের ভিক্ষা করেছে। এইজন্যই বলেছি মণি ও মোহিনী পরস্পর পরস্পরের তুলনীয়া এবং অতুলনীয়। অতএব দুই ভিন্ন সময় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন সাহিত্যিক লক্ষ নিয়ে লেখা হলেও দুটি উপন্যাসেই বাংলা সাহিত্যের অপরিহার্য সম্পদ — একটি প্রাথমিক যুগের পথপ্রদর্শক অন্যটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পের চূড়ান্ত রূপ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন মেরুর প্রতিনিধি। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে 'কাহাকে' এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই উপন্যাসে নারীর কণ্ঠস্বর প্রথমবারের মতো সাহিত্যিক রূপে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা মণি সমাজের বাঁধন ভাঙতে চাইলে বারবার রক্ষণশীলতার চাপের মুখোমুখি হয়। এই উপন্যাস আমাদের জানায় নারী যদি শিক্ষিত ও সচেতন না হয় তবে তার মুক্তি অসম্ভব। তারাশঙ্করের 'রাধা' সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিসর। এখানে তিনি পৌরাণিক রাধাকে আধুনিক মানব জীবনের প্রতীকী চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। প্রেম কামনা লালসা ত্যাগ আত্মসমর্পণ ও মুক্তি এই চিরন্তন প্রশ্নগুলিকে তিনি রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায় ব্যক্তিগত প্রেম একসময় মহাজাগতিক প্রেমে রূপান্তরিত হয় যা মানুষকে দার্শনিক স্তরে নিয়ে যায়। তাই উপন্যাসটি সমাজ সংস্কার নয় বরং মানুষের অস্তিত্ব সংকট জীবন প্রবাহ ও মহাশক্তির অনুসন্ধান।

আলোচ্য দুই উপন্যাস কেবল তাদের সময়ের দলিল নয় ভবিষ্যৎ সাহিত্যের দিকনির্দেশনা দিয়েছে। নারী শিক্ষা আত্মমর্যাদা সামাজিক কুসংস্কার ভাঙার প্রয়োজনীয়তা এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত। ভবিষ্যতের নারী লেখকদের জন্য এটি পথ প্রদর্শক। পরবর্তী প্রজন্মের লেখকরা যেমন আশাপূর্ণা দেবী বা মহাশ্বেতা দেবী সমাজ ও নারী জীবনের নানা প্রশ্ন নিয়ে লিখেছেন তার বীজ নিহিত আছে 'কাহাকে'তে। 'রাধা' উপন্যাস কেবল সমাজের প্রতিচ্ছবি নয় বরং মানুষের গভীরতম দার্শনিক প্রশ্নেরও বাহন হতে পারে। এখানে সাহিত্য প্রতিকূলতার ও মহাকাব্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে।।

"স্ত্রীলোকের কবিতার বেশি প্রশংসা করতে আমরা ভয় পাই-পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল, গৃহকর্ম ছাড়িয়া সকলের হস্তই কাগজ-কলম লইয়া বসেন তাহলে গরীব পুরুষের দল একমুঠো অন্য পাইবে না।" (মন্তব্যটি করেছেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায়) স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' এক সার্থক আধুনিক উপন্যাস। এক নারীর কলমে উঠে এসেছে আর এক নারীর অন্তর বেদনা, নারীর আঁতের কথা। এটা প্রশংসনীয় ছাড়া আর কি হতে পারে! উপন্যাসটি তুলনামূলক ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্যে আগাগোড়া স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয়স্পর্শ সুর বারবার ধ্বনিত হয়েছে। আমরা

জানি সমাজে নিন্দুক আছে যথেষ্ট তেমনি তার সমালোচনা আছে বহুবিধ। সে ভালো হোক বা মন্দ তাই বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক সমালোচনার ঊর্ধ্বে গিয়ে এটা বলতে হয়, ঊনবিংশ শতকের একজন নারীর লেখনীতে লেখা গেছে এমন একটা উপন্যাস যা বিশ শতক বা তার পরবর্তী সময়ে লেখাকেও হার মানাবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ‘‘স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক ও অন্যান্য সামাজিক উপন্যাসে চিরস্থায়িত্বের কোন লক্ষণ নাই; কিন্তু ‘কাহাকে’ তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান ও অন্যান্য মহিলা-ঔপন্যাসিক হইতে তাঁহার প্রতিভার স্বতন্ত্র পরিচয়।’’[৮]

অন্যদিকে তারাশঙ্করের রাধা বিহীন ‘রাধা’ উপন্যাসটি পাঠকের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোহিনীর মাধবানন্দকে কৃষ্ণের রূপে আরাধনার বিষয়টি। উপন্যাসটির নায়িকা মোহিনী, প্রেমে সে রাধার সমরূপিণী এবং অপেক্ষা বা তপস্যায় সে মীরার অনুরূপিনী। সমগ্র উপন্যাসটি জুড়েই ‘গীতগোবিন্দ’ ও ‘গীতা’ থেকে মাঝে মাঝে শ্লোক এবং উদ্ধৃতির ব্যবহার করে তারাশঙ্কর উপন্যাসটিকে একটা অন্য স্তরে নিয়ে গেছেন। উপন্যাসটির পরিণতিতে অবশেষে মাধবানন্দের মোহিনীকে রাধারূপে স্বীকৃতি দেওয়া পাঠক মনে এক অদ্ভুত চমক সৃষ্টি করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ‘‘উপন্যাসটির নামে ঐতিহাসিক হলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা অন্তর্জীবকনের কাহিনি। ইহার বহির ঘটনাসমূহ এই অন্তর্জীবকনের আবেগচক্রে ঘূর্ণায়িত। ইহার ঐতিহাসিক অংশ অনেকটা বাহির হইতে আরোপিত, ইহার মর্ম কথার সহিত শিথিল-সংলগ্ন।’’[৯] পরিশেষে বলা যায় দুই ভিন্ন শতকের ঔপন্যাসিকের ভিন্নধর্মী উপন্যাসের নায়িকা মণি ও মোহিনীর কণ্ঠস্বর এক স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। ‘কাহাকে’, স্বর্ণকুমারী দেবী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৮০
২। ওই, পৃ. ৭৪
৩। ‘রাধা’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
৪। ওই, পৃ. ১৫৭
৫। ওই, পৃ. ১৫৮
৬। ওই, পৃ. ২০৩,
৭। ওই, পৃ. ৩০৬
৮। ‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৫৮
৮। ওই, পৃ. ৩২০

—

© Santiniketan Sahityapath